পেশায় ও মর্যাদায় নারী

উম্মে মুসলিমা

আদিযুগে যখন ছিল না কোনো সম্পত্তির ধারণা, ছিল না উত্তরাধিকার প্রথা, ছিল না আইন কিংবা সংস্থা, উপাসনা করা হতো অলিঙ্গ টোটেমের, তখন নারীর মর্যাদা ছিল। প্রকৃতিকে মনে করা হতো মায়ের মতো। নারী জন্ম দেন সন্তান, প্রকৃতি ফসল। এ কারণেই কৃষিকাজের ভার অনেকটাই দেয়া হতো নারীর ওপর। সন্তান ও শস্যকে দেবতাদের দান বলে গণ্য করা হতো বলেই উর্বরতার শক্তি হিসেবে নারী ছিলেন পূজনীয়। অতঃপর শতাব্দী-পরম্পরায় নারীর ভাগ্য জড়িয়ে যায় সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার সাথে। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার কালে পুরুষ নারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সম্পত্তির মালিকানা ও দানের সকল অধিকার। অদ্যাবধি নারীজাতি সেই বঞ্চনার ঘূর্ণাবর্তে পাক খেলেও নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে আজ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু পদে পদে বাধা ঠেলতে গিয়ে রক্তাক্ত হতে হচ্ছে তাদের, প্রতিক্ষেত্রে।

উন্নয়নে নারীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। নারীরা শিক্ষিত স্বাবলম্বী হচ্ছে। প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে নারী তার নিজ যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু নারী কি তার সঠিক মর্যাদা পাচ্ছে? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মদক্ষ নারীর ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম অসৎ, কম দুর্নীতিবাজ, কম ফাঁকিবাজ। কিন্তু পুরুষ তাদের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তনে নিতান্তই অনিচ্ছুক বলে নারীর এসব অর্জনকে বাঁকাভাবে দেখছে। কী প্রশাসনে, কী ব্যবসা-বাণিজ্যে, কী শিল্প-সংস্কৃতিতে, কী শিক্ষাক্ষেত্রে সবখানেই এক চিত্র। প্রশাসনে উচ্চ পদমর্যদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন এমন নারীদের সম্পর্কে অনেক পুরুষেরই মন্তব্য 'মন্ত্রী-সচিবদের পাওনা মিটিয়ে তবেই না পদ পেয়েছেন। ওদের মাথায় আবার ঘিলু আছে নাকি!' বছর দশেক আগে প্রশাসনের উচ্চপদে উন্নীত এক নারী কর্মকর্তাকে আড়ালে 'হোর' বলেছিলেন ছেলের বয়সী তাঁরই জুনিয়র পুরুষ সহকর্মীরা। ভদ্রমহিলার বয়স তখন পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পদোন্নতি হলে তার পেছনেও অনেকে অন্যকিছুর গন্ধ পান। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তো ধরেই নেয়া হয় গডফাদারদের সন্তুষ্ট না-করে কেউ এগিয়ে যেতে পারে না। এমনকি লেখক-কবিও নাকি হওয়া যায় না সম্পাদকদের চাহিদা না-মিটিয়ে। বিদেশে পোস্টিং-এর জন্য কর্তৃপক্ষের 'ইনডিসেন্ট প্রোপোজাল'-এ সাড়া না-দিলে নৈব চ।

মিতালি শাকিল (ছদ্মনাম) মাঝারি মাপের কর্মকর্তা। শিক্ষিত, স্মার্ট। অফিসের বস বিভিন্ন সেমিনার কর্মশালায় মিতালিকে মনোনীত করেন। মিতালি চমৎকার উপস্থাপনায় নিজের দপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিদেশে অফিসিয়াল ভ্রমণে মিতালিকে দুবার মনোনয়ন দেয়া হয়। ব্যস্ আর যাবে কোথায়! মিতালির পুরুষ সহকর্মীরা বস আর মিতালিকে জড়িয়ে বিতিকিচ্ছিরি রটনা শুরু করে দিল। এদিকে বসের বউ এসে অফিস তোলপাড় করে তো ওদিকে মিতালির স্বামী তালাকনামা প্রস্তুতের জন্য কৌশুলির শরণাপন্ন হন। শেষপর্যন্ত বেচারা মিতালি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরকন্নায় মনোনিবেশ করতে বাধ্য হন।

বিদেশে হাইকমিশনে কর্মরত শাহরিন মাসুদ (ছদ্মনাম)-এর খুব সুনাম। একই পদমর্যাদায় ওখানে আরো একজন দেশি পুরুষ আছেন। কিন্তু পদোন্নতি হলো শাহরিনের, তাঁর যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও পরিশ্রমের গুণে। পুরুষ সহকর্মী দেশে ফিরে এলেন। এসেই বন্ধু কলিগদের কাছে বানের জলের মতো গলগল করে শাহরিনের দুর্নাম ঢেলে দিতে লাগলেন। একদিন রাতে নাকি স্বামীত্যাগী শাহরিন তাঁকে শরীর খারাপের অজুহাতে ডেকে নিয়ে পরিকল্পনামতো সাড়া পান নি বলে রাগে দুঃখে কর্তৃপক্ষকে বলে কয়ে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পুরুষের ধারণা নারীর কেবল একটাই সম্বল, আর তা হচ্ছে তার যৌনাকর্ষণ। পুরুষকে জীবিকার সন্ধানে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পরিশ্রম, তদবির ইত্যাদি শেষ করেই নিজের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা লাগে। আর নারী? কবিই বলে দেন '...তোর তো আছে নাভির নিচে টাকার থলি, ভাঙিয়ে খাবি'।

> সমাজও চায় যে নারী নিজেকে করে তুলবে কামসামগ্রী। যে-ফ্যাশনের জন্য সে নারী হয়ে উঠেছে, তাকে একটি স্বাধীন ব্যক্তি হিশেবে প্রকাশ করা তার উদ্দেশ্য নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের কামনার কাছে তাকে একটি শিকাররূপে দান করা, তাই সমাজ তার কর্মোদ্যোগকে এগিয়ে দেয় না, বরং চেষ্টা করে সেগুলোকে ব্যাহত করার। (*দ্বিতীয় লিঙ্গ, সিমেন দা বোভোয়ার*)

আসলে নারীর যোগ্যতা নিয়ে পুরুষের এসব অপবাদ নিছকই ঈর্ষা। নারীর অগ্রগতির বয়স খুব বেশিদিনের নয়। বেশিরভাগ পরিবারেই এখনো মেয়েশিশুকে দ্বিতীয়স্তরের মানুষ বলে গণ্য করা হয়। কেউ বলেন, 'মেয়ের পেছনে অত ঢেলে করবটা কী? মেয়েকে তো বিদায় করতেই হবে। বিদায়ের সময় ওদের ভালো থাকার জন্যই তো এখনকার এ কৃচ্ছ্রতা'। অনেকে নিজেকে একটু উঁচুস্তরের প্রতিপন্ন করার জন্য বলেন, 'মেয়ের শখই বেশি পূরণ করি। পরের বাড়ি গিয়ে কীভাবে থাকবে না থাকবে...'।

> পিতামাতারা আজো কন্যাদের তাদের বিকাশের জন্য বড়ো না-ক'রে বড়ো করে বিয়ের জন্যে; তারা এর মাঝে এত বেশি সুবিধা দেখতে পায় যে তারা নিজেরাই এটা চাইতে থাকে; এর ফল হচ্ছে এই যে, তারা সাধারণত হয় কম প্রশিক্ষিত, ভাইদের থেকে তাদের ভিত্তি হয় কম দৃঢ়, তারা তাদের পেশায় মন দেয় অনেক কম। এভাবে তারা নিজেদের নষ্ট করে, থেকে যায় নিম্নস্তরে, হয় নিকৃষ্ট এবং গড়ে ওঠে দুষ্টচক্র : পেশাগত নিকৃষ্টতা তাদের ভিতরে বাড়িয়ে তোলে একটি স্বামী লাভের আকাঙ্ক্ষা। (*দ্বিতীয় লিঙ্গ, সিমেন দা বোভোয়ার*)

প্রকৃতপক্ষে নারী পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে বেড়ে ওঠার সুযোগ পান না। নারীর সকল প্রকার অমর্যাদা, অধস্তনতা, নির্যাতন, পীড়ন, বন্দিদশা ও যাবতীয় দুরবস্থার জন্য পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবই যে দায়ী তা সুশিক্ষিত বিবেকবান মানুষের অস্বীকার করার উপায় নেই। এখনো নারীকে একজন মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে পুরুষকুল অপারগ। একদিন একজন পুরুষ সঞ্চালিত নারী দিবসের একটি টিভি টকশোতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারীদের উপস্থিতিতে নারীর প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আজকের শিক্ষিত নারীরা কোন কোন পেশায় যেতে চান বা কে কী হতে চান সঞ্চালকের এরকম জিজ্ঞাসার জবাবে নারীরা চ্যালেঞ্জিং সব পেশাতেই সফল হচ্ছেন বলে তাঁরা জানালেন। কেবল একজন বললেন, সবার আগে মানুষ হিসেবে মর্যাদা পেতে চাই। এখনো নারীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে অনেকেই কুণ্ঠাবোধ করেন। নারীর যে চিত্র তাদের মর্মমূলে প্রোথিত, সেখান থেকে বের হয়ে আসা কয়েক পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পাঠগ্রহণের পর কিছুটা হলেও সম্ভব। নারীর শারীরিক দুর্বলতাকে তার অযোগ্যতা হিসেবে দেখা হয়। এই সেদিনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ শিক্ষক জেন্ডার সাম্যের আলোচনায় বারবার বলছিলেন, 'কর্মক্ষেত্রে নারী আর পুরুষ কীভাবে সমতা আনবেন? একজন নারী কি পুরুষের মতো পেশিশক্তির অধিকারী? তিনি কি পুরুষের মতো দশমণি বস্তা টানতে পারেন?' আশ্চর্য! এখনো কায়িক পরিশ্রমকে কর্মের আদর্শ বিবেচনা করে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করছেন। নারী যে একজন নীতি-নির্ধারকও হতে পারেন, এ তাঁর মাথাতেই নেই। অথচ তাঁর চোখের সামনেই রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ স্থানে নারী। তাই অনেকেই মনে করেন, নারীরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের অনুপযোগী, নেতৃত্ব প্রদানে মেধাহীন। কেবল সন্তানধারণ, জন্মদান ও লালনপালনই নারীর উপযুক্ত কাজ। এখনো নারীদের কোনো সভা বা সম্মেলনের খবর ছাপতে গিয়ে সাংবাদিকরা লেখেন, অসংখ্য নারী যোগদান করেছিলেন। আর কোনো জনসভায় যেখানে নিরানব্বই ভাগ পুরুষ সেটার খবরে লেখেন, মানুষে মানুষে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। তো, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ থেকে দূর না-হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীরা অমর্যাদার শিকার হতেই থাকবেন।

তবে একথাও অস্বীকার করার কিছুই নেই যে, শিল্প-সংস্কৃতি অর্থাৎ সংগীত, যাত্রা, নাটক, সিনেমা, মডেলিং ইত্যাদি বিকাশের কালে নারীকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। নারীর প্রতিভা ছিল কিন্তু সুযোগ ছিল কম। এ সকল নারীকে অনেক অসম্মান সহ্য করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয়েছে। শুধু শিল্প-সংস্কৃতি কেন? উচ্চশিক্ষা গ্রহণেও নারীর অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। সেই কৌতুকটা অনেকেরই জানা। গ্রামের এক ভদ্রলোক সেই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তাঁর ছেলেকে দেখে বাড়ি ফিরে গেলেন। সবাই 'ছেলে কেমন আছে, কোথায় থাকে' ইত্যাদি

প্রশ্নে তাঁকে অস্থির করে তুলছিল। তিনি বললেন, 'ছেলে তো ভালোই আছে। কিন্তু সে যেখানে থাকে সেখান থেকে বেশ্যাপাড়াটা খুব কাছে।' বলা বাহুল্য, ছেলে থাকত সূর্যসেন হলে আর তার অনতিদূরে রোকেয়া হল। ষাটের দশকে চাকরিজীবী নারীদেরও সুদিন ছিল না। তখন এদেশে চাকরি করা নারী মানেই হয় বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, না-হয় অবিবাহিত। নারীর জন্য একটাই চাকরি ছিল, তা হচ্ছে নার্সিং। বড়োজোর প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা। বিবাহিত গৃহবধূরা ছিলেন অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এমনকি এই গৃহবধূদের মনেও তাঁদের স্বামী ও পুরুষ আত্মীয়রা এরকম ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে সমর্থ হতেন যে, চাকরিজীবী নারী মাত্রেই অধার্মিক, মুখরা, নির্লজ্জ ও বাজে। এদেশের বেশিরভাগ পরিবারের পাত্রী পছন্দের তালিকায় পেশাজীবী নারী নিষিদ্ধ। এখনো অনেক পরিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দিতে চান না। যদি কেউ কেউ চানও কিন্তু হল-হোস্টেলে থাকা মেয়েদের ব্যাপারে নো-কম্প্রোমাইজ। ওদের আবার কোনো চরিত্র আছে নাকি? তাদের বিবেচনায় সবচেয়ে ভালো পাত্রী হলো মেয়েদের কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষে পড়া মাথা ঢেকেঢুকে চলা লাজুক অষ্টাদশী।

একসময় উচ্চশিক্ষায় নারীর আগমন কম ছিল বলে উচ্চপদে নারীর যোগদানও ছিল নগণ্য। এখন উচ্চশিক্ষার হার বেড়েছে। ছেলেমেয়ে একসাথে প্রায় একই অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। এসব ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত বিয়ের ধারণাও ক্রমশ অজনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তারা সহপাঠীদের সাথে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার লক্ষ্যে নিজেদের তৈরি করছেন। জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য যৌথস্বপ্নের খেয়ায় হাতধরাধরি করে এগিয়ে চলেছেন। এসব জুটির মেয়েরা কেবল ঘর-সংসার করবেন আর ছেলেগুলো রোজগার করে খাওয়াবে, এ চিন্তা তাদের ধারণার বাইরে। তারা যে যার পেশা বেছে নেয়ার জন্য শিক্ষাজীবনেই ক্ষেত্র রচনায় মনোনিবেশ করছেন। খুব আশার কথা, এ প্রজন্মের এ মনোভাবে একদিকে যেমন যৌতুকপ্রথাও অবলীলায় বিলীন হয়ে যাবে, তেমনি পেশাক্ষেত্রেও নারীকে আর আজকের মতো অমর্যাদার মুখোমুখি হতে হবে না।

উম্মে মুসলিমা কবি ও কথাসাহিত্যিক। প্রকল্প পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। lima_umme@yahoo.com